# হাতির আসা - যাওয়া

ডঃ মঞ্জু মণ্ডল (বিশ্বাস)

এশিয়া তথা ভারতীয় হস্তিকুল বর্তমানে একটি বিপন্ন প্রজাতি এবং Sehedule-I, WPA – 1972 dt. 5/10/1977 ধারায় সংরক্ষিত। অথচ বনাঞ্চল দ্রুতগতিতে সংকুচিত হওয়ার জন্য খাদ্য পানীয় ও বিচরণভূমি হারিয়ে তারা লোকালয়ে চলে আসছে, মানুষের আক্রোশের শিকার হয়ে নৃশাংস ভাবে প্রাণ হারাচ্ছে হাতিরা।

বিগত শতকের ৭০ -এর দশক থেকেই দক্ষিণ বঙ্গে হস্তি - সংক্রান্ত সমস্যার সুত্রপাত। সেই সময় থেকেই সমস্যাটা ক্রমবর্ধমান। ১৯৯৪ সালে ১৭ টি হাতি দক্ষিণ বঙ্গে প্রবেশ করেছিল। ২০০৩ সালে ৫০ টি এবং ২০০৫ সালে ৫২টি হাতি বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করেছে।

দক্ষিণ বঙ্গে দুই ধরণের হাতি দেখা যায়। দামলা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংকচুয়ারি থেকে আগত অতিথি হাতির দল এবং দক্ষিণ বঙ্গের রেসিডেন্সিয়াল হাতি যার বর্তমান সংখ্যা মাত্র ১২-১৪ টিতে দাঁড়িয়েছে।

বোঝা যাচ্ছে যে হঠাৎ ই তাদের দক্ষিম বঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। সংবাদপত্রে হাতি মানুষের সংঘাত সম্পর্কিত খবর গুলো পড়লে মনে হতে পারে যে হাতি গুলো মানব সভ্যতার পয়লা দুশমন, আর বনদপ্তরের অকর্মণ্যতার জন্যই শয়তান গুলোকে শায়েস্তা করা যাচ্ছে না।

হাতিদের যতই অনুপ্রবেশকারী, হামলাবাজ হিসেবে প্রচার চালানো হোক না কেন, প্রকৃত সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। মুনাফা লোলুপ মানুষের দলই আসল অনুপ্রবেশকারী, যারা লুণ্ঠন করেছে বুনোদের বিচরণভূমি, ক্ষুধার খাদ্য ও তৃষ্ণার জল।

ভারতে মোটামুটি ২৬,৪০০ মত হাতি রয়েছে (তথ্যসূত্র ঃ বন্যপ্রাণী শাখা, বনবিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার) আর (উত্তর দক্ষিণ মিলিয়ে) পশ্চিমবঙ্গে মোট হাতির সংখ্যা ৩২৭ (তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত) সাড়ে আট কোটি মানুষের রাজ্যে মাত্র ৩২৭ টি হাতি কোনক্রমে টিকে থাকার পরিসংখ্যানটি অত্যন্ত কলঙ্ক জনক।

কমে আসার কারণ - উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে উত্তর পূর্ব ভারতে হাতির সংখ্যাবৃদ্ধির একটা অপপ্রচারের চেষ্টা চালানো হচ্চে কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও যুক্তি তাঁরা দেখাতে পারেন নি।

(i) হাতিদের উপদ্রব হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বনদপ্তর তৈরী করে Action Plan Section II (i) (a) of Wildlife (Protection) act 1972 -যাতে হাতি ধরে কিংবা গুলি করে মেরে হাতির সংখ্যা ৩৩ শতাংশ কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়। বলা বাহুল্য এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি দুষ্কৃতিরা, বহু হাতির অকাল মৃত্যু ঘটেছে এদের হাতে।

(ii) মানুষ ব্যতীত আর কোন প্রাণীর ভোট নেই, জোট নেই, নোটও নেই তাই হাতি মানুষের সংঘাতে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয় হাতিরাই। কোন হাতির ক্ষিপ্ততায় যদি দু চারটি মানুষের মৃত্যু হয় তাহলে তাকে পাগলা বা rough ঘোষণা করে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় সেই হাতিকে। কখনো অনুসন্ধান করা হয় না সেটি জখমি কিনা কিংবা মত্ত (hot) কিনা।

(iii) হুলা করে তাড়ানোর প্রক্রিয়া এত অমানবিক যে ২০০৪ সালে নভেম্পর মাসে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পাথরমারির জঙ্গলে টানা তিনদিন একটা দলকে হুলা করে তাড়ানোর পর তারা রুখে দাঁড়ায়। পাদপিষ্ট হয়ে নিহত হয় হুলা পার্টির নেতা শঙ্কর দলুই। বস্তুত তখন একটা আসন্ন প্রসবা হস্তিনীকে তারা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। পরদিনই একটা শাবক প্রসব করে সেই হস্তিনী। অর্থাৎ তাদের পক্ষে আর দৌড়ানো সম্ভব ছিল না।

(iv) হাতিদের চিরন্তন চলাচল পথের উপর (বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ও পিয়ারডোবা স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গা) কিংবা দক্ষিণ পূর্ব রেলের চক্রধরপুর সেকশনে (ঝাড়খণ্ড ) পোসাইতা ও মনোহরপুরের মাঝামাঝি জায়গায় প্রায়ই ট্রেনের সংঘাতে হাতির মৃত্যু খবর শোনা যায়। এরকম একাধিক elephant corridor এর উপর তৈরী হয়েছে ট্রেন লাইন কিংবা মিটার গেজকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করার জন্য হাতির মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে গেছে। যদিও উক্ত এলাকায় নিয়ন্ত্রিত গতিতে অনবরত হুইসিল বাজিয়ে ট্রেন চালাবার নির্দেশ থাকে ইঞ্জিন ড্রাইভারদের প্রতি কিন্তু এই নির্দেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয়, কারণ, এই হাতি হত্যার না হয় কোনও তদন্ত, না হয় কোন সাজা। সবচাইতে মজার কথা এই ভারতীয় রেলওয়ের ম্যাসকট হলো একটা মিষ্টি খোকা - হাতি।

(v) যেসব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে সেখানে হাতির হাত থেকে ফসল বাঁচানোর সহজ পন্থা হিসেবে হুকের সাহায্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করে নগ্ন তার ক্ষেতের কিনারায় ছড়িয়ে রাখছে গ্রামবাসীরা যাতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু ঘটেছে। সচেতনতার বদলে বিদ্বেষ আর আক্রোশ ক্রিয়াশীল করছে এই ধরণের কাজের পিছনে।

(vi) কথায় বলে মরা হাতি লাখ টাকা। তাই শিকারিদের হাতে প্রায়ই দাঁতালের মৃত্যু ঘটে থাকে। আজ পর্যন্ত এই সব হত্যাকারীদের একজনেরও শাস্তি হয়নি (তথ্য Glimpses of Wild life statistics 2002-2003)।

হাতির জৈব চলাচল-

হাতিরা পরিযায়ী স্বভাবের প্রাণী। এই অতিকায় প্রাণীদের খাদ্যের চাহিদা (দৈনিক মাথাপিছু ১৫০ কেজি) ও যোগানের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই এমন প্রাকৃতিক নির্ধারণ। আমাদের আলোচ্য হস্তিকুল উড়িষ্যার কেওনঝাড় ও সুন্দরগণ এব ঝাড়খণ্ডে র সারাণ্ডার বিস্তীর্ণ অরণ্যে আবহমান কাল থেকে বাস করতো। শুধু বসবাস নয় সমগ্র অঞ্চলে এ বার চলাচলের জন্য হাতিরা তৈরী করেছিল তাদের নিজস্ব corridor। শুখা - মরসুম (dry season) অতিক্রান্ত হলেই তারা মূল বসতি ছেড়ে ছোট ছোট উপদলে ভাগ হয়ে সিক্ত - মরসুম •wet season habitat) কালীন আবাসের উদ্দেশ্যে রওনা হতো। এইভাবে দীর্ঘ ৪-৬ মাস অন্যত্র যাপন করতো যাতে মূলত বসতি অঞ্চলে নতুন বনসৃজনের অবকাশ হয়।

হাতিদের প্রচরণশীলতার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে - সেটা হল সুস্থ ও সুষ্ঠু বংশগতির ধারা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জৈব-মিলন (inter – population breeding) অত্যন্ত আবশ্যিক শর্ত।

এমনিতেই হাতিদের প্রজননক্ষমতা খুবই কম। একজোড়া হাতি ৩০ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত সর্বাধিক ৬টি শাবক প্রসব করতে পারে।

জৈব চলাচলের পথ পরিবর্তন-

আজ থেকে চার দশক আগে যেসব হাতিদের বিচরণভূমি ছিল পশ্চিম সিংভূম, উড়িষ্যা এবং পুরুলিয়ার অংশবিশেষে তারা কখনোই এ রাজ্যের বনদপ্তরের শিরঃপীড়ার কারণ হয়নি। এখন প্রশ্ন হস্তিযূথ তাদের সাবেক কালের অরণ্যের বদলে ঘনবসতিপূর্ণ মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় দীর্ঘকাল অবস্থান করছে কেন ?

একটা প্রচলিত ও সহজ উত্তর আমাদের মস্তিষ্কে গেঁধে দেওয়া হয়েছে যে বিগত শতকের মাঝামাঝি মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার বনস্পতি সমৃদ্ধ নবীন বনাঞ্চল হাতিদের আকৃষ্ট করেছে আর তিন ফসলি জমির শস্য ও আনাজ তাদের প্রলুব্ধ করেছে, যার জন্য দক্ষিণবঙ্গে হামলা করেছে এরা।

বলা বাহুল্য এটি অল্পবিদ্যা প্রসূত একটা সহজ সমীকরণ যা একেবারেই ভ্রান্ত, এর থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

সঠিক কারণ অনুসন্ধান করতে এবং সমাধানের পথ খুঁজতে শ্রী কিশোর চৌধুরীর নেতৃত্বে ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশান সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার একটা বিশেষজ্ঞ দল দীর্ঘ আটমাস ব্যাপী সতর্ক পর্যবেক্ষণ করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তা এইরকম -

প্রথমত- দক্ষিণবঙ্গের নবীন বনাঞ্চল এবং নেহাতই patch forest, যা কোনো অবস্থাতেই চরিত্রগত দিক থেকে তাদের মূল বসতি দলমা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংকচুয়ারির মত স্বাভাবিক, আদিম ও ঘন নয়।

দ্বিতীয়ত- দক্ষিণবঙ্গের এই পাতলা বিক্ষিপ্ত (patch) বনাঞ্চলে তাদের খাদ্যের যোগান খুবই সীমিত (marginal)। তারা যখন সিক্ত ঋতুকালীন আবাস ছেড়ে দলমায় প্রত্যাবর্তন করে তখন তাদের পিঠের হাড় চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি প্রকট হয়ে যায়। এছানা, তাদের বর্জ্যের (মল) পরিমাণ থেকেও এই বক্তব্য সমর্থিত হয়

তৃতীয়ত- হাতিরা অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের মতোই মানুষদের সান্নিধ্য অপছন্দ করে। তা সত্ত্বেও তারা দক্ষিণবঙ্গের ঘন বসতিপূর্ণ হালকা ও নবীন বনাঞ্চলে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

নিশ্চয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণে তাদের শেষ অবলম্বন এখন দক্ষিণবঙ্গ।

বিশেজ্ঞদের মতে বিগত চার দশক ধরে তথাকথিত উন্নয়নের চাপে বনভূমি সংকুচিত হচ্ছে, ফলে ধ্বংস হচ্ছে বন্যপ্রাণী। অন্যান্য বন্যজীবের মত হস্তিকুল যদি নিঃশব্দে লুপ্ত হতো তাহলে ঝামেলা ছিলনা, কিন্তু এই অতিকায় যূথবদ্ধ অথচ নিরীহ প্রাণীরা টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এখনও।

ঋতুকালীন পরিচালন - পথ পরিবর্তনের কারণগুলি-

(১) আকরিক লৌহ উৎপাদন - আন্তর্জাতিক বাজারে (বিশেষত চীনে) ইস্পাতের অভূতপূর্ব চাহিদা বৃদ্ধি এবং ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের খরচ পৃথিবীর মধ্যে ন্যূনতম হওয়ার কারণে ভারতীয় সংস্থাগুলো উন্মত্তের মতো এই কারবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আকরিক লৌহ - সমৃদ্ধ দলমা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংকচুয়ারী সহ সমগ্র মালভূমি অঞ্চল এখন খনি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে তোলপাড়। প্রায় এলোপাথাড়ি ছোটো বড়ো মাঝারি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানাতেও নতুন নতুন এলাকা লিজ দেওয়া হচ্ছে। কোর (core) এরিয়াও বাদ যায়নি। আমরা যদি সাম্প্রতিক খনি - মানচিত্র দেখি তাহলে বোঝা যাবে অভ্র, ইউরেনিয়াম, তামা এবং আকরিক লৌহখনির চক্রব্যূহে হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী কি অসহায় ভাবে বন্দি।

এই সুযোগে চলছে প্রচুর সাদা - কালো টাকার লেন - দেন আর মুনাফাখোর নাগরিকদের উদর স্ফীত হলেও আদিম ভূমিপুত্ররা (আদিবাসী সম্প্রদায়) ওই বন্যপ্রাণীগুলোর মতোই হচ্ছে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের চিরন্তন অরণ্যের অধিকার।

(২) সুবর্ণরেখা মাল্টিপারপাস প্রোজেক্টঃ ১৯৮২ সালে ২,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পটি চালু হয়। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের বিস্তীর্ণ আদি বনভূমি ফাঁকা করে দীর্ঘ ভূমিক্ষেত্র দখল করে সিমেন্ট বাঁধানো খাল তৈরী করে অবশেষে ১৯৯৩ সালে অর্ধপথে গোটা প্রকল্পই ব্যর্থ ঘোষণা করে পরিত্যক্ত হয়।

আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমান যে অনেকখানি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু গোটা সারাণ্ডা বন ও বন্য প্রাণের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে সে তুলনায় আমাদের ক্ষতির পরিমাণ অতি নগণ্য।

এই খালের অনেকগুলোই হাতির আবহ কালের জৈব - চলাচল পথের উপর নির্মিত। খাল পাড়ের ঢাল ৪৫ ডিগ্রির বেশি হওয়ার দরুণ হাতিদের পক্ষে তা অতিক্রম করা অসম্ভব।

(৩) তৈরী হয়েছে পাকা সড়ক; আকরিক পণ্য ও যন্ত্রপাতি পরিবহনের জন্য। পরিবহন যানগুলোর তীব্র গতি, বিরাট শব্দ কিংবা আলো সবই সুস্থ আরণ্যক জীবনের পক্ষে অন্তরায়।

(৪) দলমার বাফার জোনে গড়ে উঠেছে ৩৭টা নতুন গ্রাম। প্রায় প্রতিটা গ্রামে চলে বেআইনী মদ তৈরীর কারবার। এসবের গন্ধ হাতিদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, তারা চলে আসে মানুষের কাছাকাছি আর আনিবার্য হয়ে ওঠে হাতি - মানুষ সংঘাত। উপরন্তু চোলাই মদ তৈরীর জ্বালানির জন্য ব্যাপকভাবে কাটা হয় গাছ। প্রসাসনের জ্ঞাতসারেই রমরমিয়ে চলে ব্যবসা।

এই ভাবে চারিদিকে উন্নয়মূলক কার্যকলাপে দলমার হাতি বাস্তুচ্যুত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে আটকে পড়েছে ছোটো ছোটো দলে। এদের বলা হচ্ছে stay group¼ এরা যে কি পরিমান বিপন্নতার শিকার তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় অযোধ্যা পাহাড়ে সম্প্রতি জাপানের সঙ্গে কোলাবরেশন-এ যে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের কাজ চলছে তার ভবিষ্যত সুবর্ণরেখা মাল্টিপারপাস প্রোজেক্ট এর মতো প্রহসনে পরিণত হলে আশ্চর্যের কিছু নেই।, সমস্ত পাহাড়টাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে আদিম বনভূমি নির্মূল করে ওই খরা প্রবণ অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযুক্ত জলপ্রবাহ থাকবে কিনা সন্দেহ। তবে এটা নিঃসন্দেহ, যে, সংলগ্ন এলাকার আবহাওয়া বদলে যাবে। তেমনি হাই - টেক নির্ভর প্রকল্পে ক'টা স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হবে সেটাও সন্দেহের ঊর্দ্ধে নয়। স্বয়ং বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মন এই প্রকল্পের উপযোগিতা নিয়ে সন্দিহান।

২০০৩ সালে সমীক্ষক দল ১৬টি হাতি দেখতে পেয়েছিলেন অযোধ্য পাহাড়ে। উক্ত প্রকল্পের জন্য মাঠা ও বাঘমুণ্ডির মাঝামাঝি elephant corridor ধ্বংস হওয়ার ফলে সেখান থেকে ১০টি হাতি কোন অজ্ঞাত পথ ধরে দলমায় ফেরৎ গেলেও আজ অবধি সেকানে ৪টি কিংবা ৬টি হাতি শোচনীয়ভাবে আটকে রয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে অভিযান ও সমস্যা-

হাতিদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নেতিবাচক। যেহেতু এরা ৭০-এর দশকের পূর্বে দক্ষিণবঙ্গে আসেনি, কিংবা পুরুলিয়ার অরণ্যময় অযোধ্যা পাহাড় পর্যন্তই গতিবিধি ছিল সীমাবদ্ধ, তাই এরা আমাদের চোখে অনুপ্রবেশকারী হামলাবাজ মাত্র।

হুলা - ১৯৮৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সর্বপ্রথম হুলা পদ্ধতিতে হাতি খেদানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। টিন, ক্যানেস্ত্রা প্রভৃতি বাদ্যসহ সতাধিক মানুষ সূচালো বর্শার কণ্ঠদেশে দাহ্য পদার্থে ভেজানো গোলকে অগ্নিসংযোগ করে তেতে লাল হয়ে যাওয়া তীক্ষ্ণ মুখ অস্ত্রটির সাহায্যে খোঁচা এবং ছ্যাঁকা দিয়ে হাতির পালকে তাড়া করে। এর হাতলে থাকে কাঠের ঘেরাটোপ যাতে মানুষের হাতে তপ্ত শলাকার ছ্যাঁকা না লাগে।

এইভাবে হাতির পালকে হৈ হৈ করে দীর্ঘ সময় (কখনো টানা তিনদিন) ধরে তাড়ানো হয়। এর সুফল বলতে হুলাকারী প্রত্যেক গ্রামবাসী বনদপ্তর থেকে লাভ করে দৈনিক ১০০ টাকা মজুরি আর টিফিন বাবদ ১৫ টাকা। ওখানকার হতদরিদ্র মানুষ এবং যাদের মারফৎ টাকা বিলি হয় তাদের পক্ষে এই বন্দোবস্ত যথেষ্ট লোভনীয়।

এবার ক্ষতির দিকটা খতিয়ে দেখা যাক - তাড়া খাওয়া হাতিগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দল ভেঙে গেলে স্বভাবতই এরা বিভ্রান্ত এবং উত্যক্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করে। পুনরায় যতক্ষণ না দলটা একত্রিত হচ্ছে ততক্ষণ এরা স্বাভাবিক হয় না। কখনও এমনও ঘটেছে (19th September 2003) একদল হুলাপার্টি বনান্তরে হাতি তাড়িয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে যে অন্য এলাকার বিট অফিসারের নেতৃত্বে অপর একটা হুলাপার্টি হাতির অনুপ্রবেশ ঠেকাবার জন্য তেড়ে আসছে। মর্মান্তিক করুণ অবস্থায় হাতিগুলো দুই দলের মাঝে বন্দি। বুঝতে অসুবিধে নেই যে হাতি তাড়ানো খেলায় কি অব্যবস্থা আর অনিয়ম চলে।

হুলার বিকট তাড়ায় হাতিগুলো খেত খামার বাগানের উপর দিয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ায়, পিছনে ওই একই পথ ধরে শতখানেক কি আরও বেশি মানুষ নামক পৃথিবীর হিংস্রতম প্রাণী ধাওয়া করে, আর উভয়ের দাপাদাপিতে মাইলের পর মাইল ফসল তছনছ হয়। সেই সংবাদই ফলাও করে ছাপা হয় সংবাদপত্রে।

এতে কিন্তু অসুবিধার চাইতে সুবিধার দিকটার ওজন বেশি, কারণ ক্ষতিপূরণের ঘোলা জলে চলে যাচ্ছে মাছ ধরা।

ক্ষতিপূরণের পালা-

(১) বছরে পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তরকে হস্তিজনিত ক্ষতিপূরণ দিতে হয় প্রায় ১ কোটি টাকা। হুলার হিসেবে তো আলাদা। গ্রামবাসীদের ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান নির্ধারণের দায়িত্বে থাকে (i) Block এর কর্মাধ্যক্ষ (ii) পঞ্চায়েত প্রধান (iii) বনদপ্তরের Range Officer, আবার এঁদের মারফৎই টাকা বিলি করা হয়। গ্রামবাসীদের ক্ষোভ, ক্ষতিপূরণের টাকা পর্যাপ্ত নয় এবং বহু বিলম্বে পাওয়া যায়।

ক্ষেতের ফসল কখনোই বুনো হাতির খাদ্য নয়। হাতির দল দক্ষিণবঙ্গের চাপড়া (patch) জঙ্গলগুলোর একটার থেকে আর একটার দিকে যখন যাত্রা করে সেই সময় যেসব ফসলের ক্ষেত ও গ্রাম তাদের পথে পড়ে তখন কিছুটা ফসল (উৎপন্ন ফসলের বড়োজোর ১০-১৫ শতাংশ) তারা উদরসাৎ করে। তদন্তকারী বিশেষজ্ঞদল তাদের মল পর্যবেক্ষণ করে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এছাড়া, হাতির পাল উত্যক্ত না হলে স্বভাব অনুযায়ী যাত্রা পথ বা স্তুপ্সজ্জজ্নস্তুপ্সজ্জ তৈরি করে নেয় যার সর্বাধিক প্রস্থ ৩ থেকে ৩.৫ মিটার হয়। ফলে হাতির পায়ে পিষে যাওয়া ফসলের পরিমান অতি সামান্য হয়ে থাকে।

হাতির পাল গ্রামে ঢুকে ঘর ভেঙে দিয়েছে কিংবা মানুষকে আক্রমণ করেছে - এমন অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায়। হাতির মত ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের প্রাণী এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কিছু সংগত কারণ আছে। হাতিদের মাদকাসক্তি অত্যন্ত প্রবল তেমনি প্রখর তাদের ঘ্রাণশক্তি। এইসব গ্রামগুলোতে একটা দুটো মদ চোলাই তৈরির ঠেক রয়েছে। সঞ্চরণশীল

হাতির পাল এসবের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামে হানা দেয়, ঘর ভাঙে, গৃহস্থের সঞ্চিত ফসল লুঠ করে। কিছু দিন আগে হাতির পাল (২২ মে ২০০৫, বড়জোড়া রেঞ্জ) মাদক সেবনকারী এক ব্যক্তিকে শুঁড়ে তুলে প্রথমে ঘ্রাণ নিয়ে তারপর আছড়ে মারে।

চোলাই মদের ঠেকগুলো সবই চোরাগোপ্তা কারবার। দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণের জন্য গল্পটাকে অন্যভাবে সাজাতে হয়। যদিও প্রকৃত ঘটনা গ্রামবাসী, বনদপ্তর কিংবা স্থানীয় প্রশাসন কারোই অজানা নয়।

(ক) পর্যালোচনা করে এই নিষ্কর্ষে উপনীত হওয়া যায়ে, যে উন্নয়নের তীব্র চাপে সিংভূমের হাতিরা তাদের মূল বসতি থেকে উৎখাত হচ্ছে।

(খ) সাবেক জৈব চলাচল পথগুলো হয় ধ্বংস নয় রুদ্ধ হয়েছে। বাধ্য হয়ে হাতিরা নতুন পথ ও আস্তানা খুঁজছে, ফলে ক্রমশ বাড়ছে হাতি - মানুষের সংঘাত।

(গ) দক্ষিণবঙ্গের নবীন অরণ্যও হাতিদের সিক্ত ঋতুর একটা বসতি। এই অরণ্য পাতলা এবং বিক্ষিপ্ত হওয়ার দরুণ একটা Patch থেকে অপর Patch এ যাওয়ার মধ্যবর্তী গ্রাম ও ক্ষেতগুলো হচ্ছে।

(ঘ) গ্রামবাসীরা ক্ষুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে বনদপ্তরকে দোষারোপ করছে। সংবাদমাধ্যমগুলো হাতির অত্যাচারের খবর এবং বনদপ্তরের খবর ফলাও করে প্রচার করছে।

(ঙ) বনদপ্তর গ্রামবাসীদের রোষ প্রশমিত করার জন্য কখনও হুলা আবার কখনও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হচ্ছে। দুটি পদ্ধতিই এই সমস্যার কোনো সুরাহা করার পক্ষে ব্যর্থ।

(চ) হস্তিযূথ দক্ষিণবঙ্গে তাদের অবস্থানের সময়সীমা যত বাড়াচ্ছে ততই হুলা ও ক্ষতিপূরণের খেলা জমজমাট হয়ে উঠছে। সমস্ত ব্যাপারটা এখন বিপদসীমা ছুঁয়ে গেছে। ভারতীয় বাঘের মতই এদের যদি আমরা মহাপ্রস্থানে পাঠাতে না চাই তবে এই মুহূর্তে তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞরা বেশ কিছুকাল থেকেই একটা হস্তী - সংরক্ষিত এলাকা গড়ে তোলার কথা বলে আসছেন। সেই সাধু প্রস্তাব অসাধুদের চক্রান্তে ফাইলবন্দি হয়ে ধুলোর আস্তরণে চাপা পড়ে আছে। হাতিদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে পুরোদমে চলছে আমাদের হাতি - হাতি খেলা।

প্রস্তাবিত হস্তী -সংরক্ষিত এলাকা-

দলমা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংকচুয়ারির পূর্বপ্রান্ত, মেদিনীপুর ঝেলার পশ্চিম প্রান্ত আর বাঁকুড়া জেলার পূর্ব প্রান্ত একত্রি ভাবে হস্তী - সংরক্ষণের আদর্শ এলাকা। এর বাস্তবায়নে জন্য প্রয়োজন ঝাড়খণ্ড আর পশ্চিবঙ্গ সরকারের সদিচ্ছা ও সমন্বয়ের।

(১) ঝাড়খণ্ডের ধলভুমগড় ফরেস্ট ডিভিশনের ঘাটশিলা রেঞ্জ।

(২) পশ্চিম মেদিনীপুর ফরেস্ট ডিভিশনের বুলোভেদা রেঞ্জ।

(৩) বাঁকুড়া (দক্ষিণ) ফরেস্ট ডিভিশনের রানিবাঁধ রেঞ্জ। ঝাড়খণ্ডের ১১০ বর্গ কিলোমিটার আর পশ্চিমবঙ্গের ৫৫০ বর্গ কিলোমিটার মোট ৬৬০ বর্গ কিলোমিটার নিয়ে অখণ্ড বনাঞ্চলকে হাতিদের জন্য সংরক্ষিত করা হোক।

প্রস্তাবিত এলাকার মধ্যে ঝাড়খণ্ডের ৪৭টি গ্রাম আর পশ্চিমবঙ্গের ২৯৭টা গ্রাম বিদ্যমান। গ্রামবাসী আর গজবাহিনীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) সুবর্ণরেখা মাল্টিপারপাস প্রোজেক্ট - এর অধীনে নির্মিত মৃত খালগুলোর উপর মধ্যে মধ্যে হাতি চলাচলের যোগ্য সাঁকো (over pass) তৈরী করতে হবে তাদের আন্তঃগোষ্ঠী জৈবমিলন অব্যাহত রাখার জন্য।

(খ) উক্ত এলাকার বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মহুয়া, চিহার, পিয়াল, বেল, কেন্দ, কুর্চি, ডুমুর, কাঁঠাল, বাঁশ, গামার, আসন বট, সোনাঝুরি, শাল, কুল, পিয়াশাল, বেনেঘাস প্রভৃতি হাতিদের প্রিয়খাদ্যের সংস্থান করতে হবে।

(গ) গ্রামবাসীদের joint forest management scheme-এর আওতায় এনে (লভ্যাংশের ২৫ শতাংশ তাদের দেওয়ার শর্তে) উপরোক্ত বন সৃজনের কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। এর ফলে হাতিদের যথেষ্ট খাদ্যের যোগান থাকলে তারা খিদের জ্বালায় হন্যে হবে না। হাতি মানুষে সংঘাত কমে যাবে।

(ঘ) হাতির সঙ্গে শত্রুতার বদলে মিত্রতা করে গ্রামবাসীদের উপার্জনের একটা ব্যবস্থা করা গেলে মন্দ হয় না। হস্তি সংরক্ষিত এলাকাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের রাজ্যের আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের ও সাশ্রয় হয়।

(ঙ) পরিবেশের যথাযথ ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম শর্ত হলো দেশের মোট ভূভাগের এক তৃতীয়াংশে বনভূমি থাকবে। সমগ্র ভারতে এই বনভূমির পরিমাণ শতকরা ২১ ভাগ আর পশ্চিমবঙ্গে এই বনভূমি রয়েছে (সুন্দরবন সহ) শতকরা ১৩.৫ ভাগ মাত্র। অতএব সামগ্রিক ও সুদূর প্রসারী কল্যাণের জন্য এই প্রস্তাব সাধু এবং ন্যায্য।

(চ) প্রত্যেকটি উদ্ভিদ প্রত্যেকটি প্রাণী প্রাকৃতিক জৈব - চক্রের শৃঙ্খল থেকে একক - তাই পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। তাদের কোনো একটি নিশ্চিহ্ন হলে জীবজগতের চরিত্র বদলে যেতে বাধ্য।

সর্বোপরি মানুষের যেমন বেঁচে থাকার ও বংশগতি রক্ষা করার জন্মগত অধিকার আছে, তেমনি জীব মাত্রেরই বেঁচে থাকার ও স্বাভাবিক বিকাশের অধিকার আছে। প্রকৃতিকে হনন করে, লণ্ঠন করে যে সভ্যতার বড়াই আমরা করে থাকি, তা হলো আত্মঘাতী অসভ্যতা মাত্র।